বাংলার নব জাগরণের ধারা : ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্ররা

দেবরাজ দাশ

ইউরোপে রেনেশাঁস হয়েছিল সাহিত্য শিল্প-কলা সমাজবিজ্ঞান ব্যবসাবাণিজ্য দেশ আবিষ্কার—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবল ঘূর্ণি হওয়া বইয়ে দিয়ে। আমাদের বাংলার রেণেশাঁস হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে আত্মমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে বাংলার রেণেশাঁসের বাহক ভাষাটি বাংলার নিজস্ব নয় এক্ষেত্রে স্মরণে রাখা দরকার স্বল্প সংখ্যক ইংরাজী নবিশেরাই এই সংস্কৃতির ধারক, বাহক, ও প্রচারক। এর জন্য কেউ কেউ পাশ্চাত্য রেনেশাঁস ও উনিশ শতকের নবগারণকে সমগোত্রে রাখতে চান না। মনে রাখা দরকার,—

> "In 'Bengal Renaissance' the term Renaissance has no doubt been copied from the celebrated European Renaissance ofter the end of what Europeans call their dark ages when the Graeco-roman civilisation had become extinct. But different or slightly similar things are often called by the same name. It would be worse than useless or quite misleading, if owing to this similarity of names we try to find out to our satisfaction, and such attempts really fail, deeper and real similarities between the great Europen and the parochial Bengal Renaissance in their causes and development."

ফলে বুঝতে বাকী থাকে না, উনিশ শতকের বাঙালীর নবজাগরণ ইউরোপীয় সংস্কৃতির নবজাগরণের সমার্থবাদী বা সমধর্মী তো নয় বরং উনিশ শতকীয় রেণেশাঁসকে পাশ্চাত্য রেণেশাঁর তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও ব্যাপক মনে করেছিলেন অনেকে ঐতিহাসিকই। তাঁদের মধ্যে যদুনাথ সকারের একটি মন্তব্য আমরা বিচার করতে পারি।—

> "It was truly a Renaissance wider, deeper and more rovolutionary than that of European after the fall of Constantinople."

বাংলার নবজাগরণ যতই সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ হোক, তবু তা একপ্রকার নতুন উপলব্ধি নিয়ে এসেছিল। এটা শুধু 'নবায়মান পুরাতন' নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শ বাঙালীকে মধ্যযুগীয় সংস্কারের পর্দা সরিয়ে আলোর পথে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল।

রামমোহনকে বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ বলা হবে কিনা, এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনার জায়গা থেকে যায়; তবে আমাদের স্বল্প পরিসরে এটুকু বলা যেতে পারে যে, উনিশ শতকে যে রেনেশাঁসের পথ খুলে যায়, তার একজন অন্যতম সূত্রকার হলেন রামমোহন। বুদ্ধিবাদী রামমোহন বুঝেছিলেন চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখা ও বিচার করাটা ভীষণ প্রয়োজন। তিনি ভারতের মাটিতে চেয়েছিলেন ইউরোপীয়ান প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ-এর প্রতিষ্ঠা। আবেগপন্থী রামমোহন বুঝেছিলেন বুদ্ধি পন্থার অনুসরণ অত্যাবশ্যক। রামমোহনের এই অনুভব অবশ্যই সময়ের ফল, যে কারণে দ্বারকানাথের মত ব্যক্তিত্বরাও রামমোহনের কলোনাইজেশনের ধারণাকে সমর্থন করেছিলেন। ১৮৯২ সালের ১৫ই ডিসেম্র কলকাতার টাউন হলে বিখ্যাত পামার এণ্ড কোং-এর সর্বাধ্যক্ষ জন পামারের সভাপতিত্বে কলোনাইজেশনের সমর্থকরা এক সভার আয়োজন করেন। রামমোহন রায় এই অনুষ্ঠানে বলেন—

> "I am impresed with the conviction that the greater our intercourse with Europan gentlemen, the Greater will be our improvement in literary, social and political affairs."

রামমোহন ও অন্যান্যরা নবজাগরণকে বিদেশী প্রভাব থেকে পৃথকভবে দেখতে চান নি। তাঁদের কাছে দেশের মানুষের নব জাগৃতি আসলে বিদেশী বণিকদের এদেশে বাণিজ্য ও বসবাসের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল। এই ভাবনার উৎসটা বোধহয় তাঁদের কাছে সঙ্গতই ছিল। যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিশক্তিহীন ভারতকে জাগাতে যুক্তি ও বিজ্ঞান মনস্কতার পীঠভূমি থেকে সাহায্য আসাটাকে তাঁরা এদেশে নবজাগরণের প্রকৃত শর্ত বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ডিরোজিও। হয়তো তিনি ভাগলপুরে না গেলে এই সত্যকে অনুভব করতে পারতেন না, হয়তো জনসনের কুঠিতে কর্মচারীর কাজ না পেলে ডিরোজিও কলোনাইজেশনের বিষময় ফল অনুভব করতে অসমর্থ থেকে যেতেন।

ডিরোজিও ভাগলপুরে যান, সেখানে নীলকুঠির কাজে তিনি যুক্ত হন। আর এখানেই তাঁর নীলচাষ তথা কলোনাইজেশন বিষয়ক সম্যক সত্যদর্শন। নীল কমিশনে (১৮৬০) সাক্ষি দিতে এসে ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট E. Dealtour — বলেছিলেন "Not a chest of indigo reached England without being stained with muman blood."[৪] ডিরোজিওর পক্ষে নীলকুঠির কাজ করা সম্ভব হল না, কেননা তাঁর মানসিক গঠন এই কাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল চিল। কলোনাইজেশন বিরোধী ডিরোজিওর মানসিকতার সঙ্গে এই সময় ইন্ডিয়া গেজেটের যথেষ্ট মেলবন্ধন ও গড়ে ওঠে। নবজাগরণের ভাবনাকে ঔপনিবেশিকতার মধ্যে দেখতে

চাননি ডিরোজিও। এবং পরবতীকালে নবজাগরণের যে ধারা তাঁর ছাত্রদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নির্মাণ করবে আধুনিক বাংলা তথা ভারতের নব জাগ্রত চৈতন্যের এক সোনালী ঐতিহ্য, সেই ধারাটিকে সম্পূর্ণভাবে উপনিবেশিকতার পথ থেকে সরিয়ে এনে প্রশ্নমুখিন যুক্তিবাদের মধ্যে দিয়ে নিজেদের জাগ্রত চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ডিরোজিও। প্রথম থেকেই তিনি ভাবনার পরিপূর্ণতার উপর জোর দিয়েছেন। পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। আর ভাবনাগত এই প্রক্রিয়াটি অনুশীলিত হয়েছে তাঁর 'Freedom to the slave' কবিতাটির মথ্যে। এতে ডিরোজিও বলেছেন—

"How felt he when he fifst was told
A slave he ceased to be;
How proudly beat his heat, when first
He knew that he was free!—"

—কবিতাটির মর্মার্থ সুন্দর বিশ্লেষন করেছেন বিনয়ঘোষ তাঁর 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' গ্রন্থে—

> "কবি ডিরোজিও বলেছেন, গোলাম যখন জানতে পারল যে সে তার দাসত্ব নির্বাসন দণ্ড থেকে মুক্ত, তখন তার অন্তরাত্মা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যখন স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেল, তখন মুক্ত মানুষের উন্নত চিন্তা ভাবনাগুলিও তার মনের অনন্ত আকাশে তারার মত ঝিকমিক করতে লাগল। কার ও কাছে সে আর নতজানু হবে না, মাথা হেঁট করবে না, মাথা উঁচু করে উচ্চ চিন্তা করবে নির্ভীক বীরের মত।...ভাবতে লাগল—এই আকাশ, এই বাতাস, এই পাখি, এই নদী— এদের মতো আমিও স্বাধীন, আমিও মুক্ত।... 'স্বাধীনতা' নামের মাহাত্ম্য এমন, যে দেশপ্রেমিক তার পবিত্র নামে সংকল্প করে তরবারি কোষমুক্ত করেন, তাঁর পরাজয় হয় না। যে বক্ষ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে...যে হাত অত্যাচারীর শৃঙ্খল ছিন্ন করে পরাধীন লাঞ্ছিত মানুষকে আত্মমর্যাদা দান করতে পারে— সে হাত ধন্য।"

বস্তুতঃ নবজাগরণকে ডিরোজিও 'সামাজিক মন' নিয়ে বিচার করলেও 'ব্যক্তিমন' নিয়ে তাকে দেখেছিলেন। ফলে ভারতের মাটিকে ভিতর থেকে না জাগিয়ে পুরোপুরি বহির্দেশীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রভাবের উপর নির্ভরশীল হতে চান নি তিনি। বিদেশি ব্যবসায়ীদের এদেশে তাদের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে চলত সংবাদপত্রে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে গোলাম ক্রয় বিক্রয়। কলোনাইজেশনের সমর্থক রামমোহন বা দ্বারকানাথ যেভাবে নীলচাষের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন নি। কিন্তু ডিরোজিওর তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতন মন দাস জীবনের দুঃখ কষ্ট সম্পর্কে সংবেদনশীল হয়ে উঠেছিল। ডিরোজিও কলোনাইজেশন কে সমর্থন করেন নি এবং রামমোহন ও অন্যান্যরা যেভাবে কলোনাইজেশন কে সমর্থন করেন নি এবং রামমোহন ও অন্যান্যরা যেভাবে কালোনাইজেশন কে নবজাগরণের সঙ্গে একাত্ম করে দেখাতে চেয়েছিলেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গিকেও সমর্থন করতে পারেন নি ডিরোজিও। ব্রিটিশ শক্তির অত্যাচারই এদেশের মানুষকে প্রথম জাগরণের মন্ত্র দিয়েছিল, উনিশ শতকের নবজাগরণের এই একেবারে প্রাথমিক বিষয়টিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন ডিরোজিও। তিনি এদেশের মানুষের পিছিয়ে পড়ার মধ্যে দেখেছিলেন তাদের আচার - বিচার, সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস আর এসবরে পাশাপাশি দেখেছিলেন এদেশের মানুষের দাসত্ব। ইউরোপের রীতি অনুসারে এদেশের রেণেশাঁস হয়নি। এদেশের যে রেণেশাঁস হয়েছিল, তা যতটুকু ব্যাপকতা লাভ করেছিল, তার মূল কারণটি ছিল ঔপনিবেশিকতার উপর নির্ভরশীল হওয়া নয় বরং নিজেদের দেশকে প্রশ্নমুখী যুক্তিবাদী করে তোলার মধ্যে দিয়ে সংস্কারমুখী প্রগতি শীলতার লড়াই।

উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণ শুরু হয়, তার ধারাই হয়তো কোন না কোনভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল উত্তর কুড়ি বাংলার প্রগতিবাদীদের ভাবনার মধ্যে। আর এই ধারাটিকে আজীবন সজীব রেখেছেন ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্ররা বহন করেছিলেন তাঁর ঐতিহ্য।

।।দুই।।

নবজাগরণের ধারা বাংলার বুকে তখন প্রবহমান। অথচ বাংলা অপেক্ষা করছিল আরো উজ্জ্বলতর আলোর। আর আঘাত দরকার ছিল বাংলার মনে, জীবনে ব্যাপকতর জীনসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। রামমোহনও বুঝেছিলেন আঘাত প্রয়োজন। এমনকি সে যুগের অনেক মানুষই এই আঘাতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তারা যে আঘাত করতে চেয়েছিলেন তা ছিল অনেকটাই বাহ্যিক। প্রয়োজন ছিল ভিতর

থেকে আঘাত— এই আঘাতই এনে দিলেন ডিরোজিও।

ডিরোজিওর জীবনকাল সংক্ষিপ্ত, তাঁর কর্মকাণ্ড ও বিশাল মহীরূহের মতো নয়, তাঁর জীবন সংক্রান্ত বহু তথ্যই কালের আয়ত্তে। অথচ উনিশ শতকের কলকাতা কিংবা বাংলার নব জাগরণ বা উনিশ শতকীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে গেলে এই স্বল্পায়ু মানুষটিকে বাদ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ডিরোজিও কি নবজাগরণের ফসল, নাকি বাংলার নবজাগরণ ডিরোজিও প্রভাবিত— এই প্রশ্ন সংকটের মুখোমুখি না হতে পারলে মানুষটির জীবনচর্চায় কিছুটা কমতি থেকে যেতে পারে।

ডিরোজিও কে 'ঝড়ের পাখি' বলেছেন পল্লব সেনগুপ্ত। আমাদের দেখতে হবে এই ঝড় কি তখন বাংলার নিজস্ব সময় প্রবাহেই উঠেছিল নাকি উঠতে বাধ্য হয়েছিল। ইংরেজদের ঔপনিবেশিকতায় ভারতের আর যাই ক্ষতি হোক না কেন এটা সত্যি যে এসময় থেকেই ভারত তথা বাংলা বুঝেছিলেন তাদের জাগবার সময় হয়েছে। এদিক থেকে রামমোহনের তুহ্ফাৎ-ইল্-মুয়াহ্-হিদীন জাগরএণর প্রথম শঙ্খধ্বনিত করেছিল। জাগরণের একটি বড়সড় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ডিরোজিও। ডিরোজিওর কাজ—হিন্দু কলেজের ভিতরে কিংবা বাইরে, সবটাই ছিল এই জাগরণমুখী। ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর কাজ, আর বলা যেতেই পারে নব জাগরণের সঙ্গে ডিরোজিও কে যুক্ত করে দিয়েছিল তাঁর ছাত্রসমাজ। আসলে ছাত্রসমাজের বাইরে তাঁর যে জীবন ছিল, তা ছিল এতটাই গৌণ যে ডিরোজিওর উজ্জ্বলতম জীবনের কাছে সে সব পাণ্ডুর, একান্তই ফ্যাকাসে।

বাংলার রেণেশাঁ প্রকৃতির আদল বদলে যে নামটি ধারণ করেছিল, তা হল ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন। উনিশ শতকের নবজাগরণের ধারাটি বস্তুত অবিচ্ছিন্ন। যে জাগরণ উনিশ শতকের ঊষালগ্নে নিতান্তই আত্মমুখী দৃষ্টি নিয়ে শুরু হয়েছিল। সেখানে ছিল আধ্যাত্মিকতার প্রশ্ন, প্রাচ্য পুরাণ সাহিত্যের পুণর্সিদ্ধি—সেই ধারাই ক্রমে পৌঁছতে লাগল মানুষের মনের কাছে যুক্তির আবেদনে। —এটাই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মর্জি। জাগরণের পালা কখনো থামে না বরং বদলে যেতে থাকে এর রূপ। পাশ্চাত্যে রেণেশাঁস যে চৈতন্যের সংঘাতে শুর হয়, বাংলায় নবজাগরণের সূচনায় যে সংঘাত না ঘটলেও ঘটতে শুরু হল উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষ দিকে। এই সংঘাত শুরু হয় প্রথমে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে, ক্রমে তা ব্যপ্ত হয় জীবন চর্যার মধ্যে। আর রূপ নিতে থাকে এক ব্যাপক আন্দোলনের। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন ডিরোজিও। অধ্যাপক সুশোভন সরকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষাশেষি...সুদক্ষ মনীষী প্রতিভাবান লেখক চরমপন্থী চিন্তাধারার সবচেয়ে খ্যাতিমান শিক্ষক ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) ছিলেন এই আন্দোলনের প্রবর্তক।''

ডিরোজিও বিশ্বাস করতেন ভারত তথা বাংলার ইউরোপীয় শিক্ষা জনগণের মধ্যে প্রচার করার চেয়ে জরুরী কাজ আর কিছুই নেই। এমন অনুভব ছিল রামমোহনেরও। আর দুজনেরই এমন ভাবনার কারণ ছিল দেশের মানুষের অন্ধ কুসংস্কারের বন্ধন। ডিরোজিও আমাদের দেশের ছেলেদের রক্তের ভিতরে সঞ্চারিত করেছিলেন মুক্ত বুদ্ধি চর্চার অনুপ্রেরণা। তিনি যে তর্ক প্রধান যুক্তি প্রবণতা ইয়ং বেঙ্গলীয়দের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন, তা তিনি পেরেছিলেন তাঁর স্কুলশিক্ষক ড্রামন্ডের কাছ থেকে সত্যের উত্তরাধিকার সূত্রে। ডিরোজিওর সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের সম্পর্কের সাদৃশ্য মেলে ড্রামন্ডের ছাত্র সংসর্গ চিত্রের মধ্যে। ড্রামন্ডের কাছ থেকে ডিরোজিও শিখেছিলেন মুক্তবুদ্ধির নিয়ত পরিচর্চা। সুবীর রায় চৌধুরী 'হেনরি ডিরোজিও তার জীবন ও সময়' বইতে বলেছেন, ড্রামন্ড ছিলেন একই সঙ্গে ভোগবাদী ও উদার মানবতাবাদী। যদিও ডিরোজিওর মতই তাঁর জীবন পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথের মধ্যে দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে। তথাপি তাঁকে ডিরোজিওর মতো অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়নি।

ডিরোজিওকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল, কিন্তু তা নিজের স্থানটিকে চিহ্নিত করবার জন্য নয়, বরং সময়ের প্রয়োজনেই তাঁকে অগ্নিদগ্ধ হতে হয়েছে। ডিরোজিও ছিলেন কবি এবং সাংবাদিক। কবিতা ছিল তাঁর প্রাণ আর ছাত্ররা ছিল তাঁর জীবনসত্য। গবেষকরা তাঁর জীবনচর্চা করতে গিয়ে কবিতা ও সাংবাদিকতা কে সূচক হিসেবে ধরেছেন, কিন্তু নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁর জীবনগ্রন্থের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি ছিল শিক্ষকতা। ডিরোজিও নানা পেশা বদল করে এসেছিলেন হিন্দু কলেজে। তরুণ কবির মনে তখন ছিল প্রগতিশীল চেতনার বিদ্যুৎসম্ভার আর কতটা দ্রুত যে সেই বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়েছিল অজস্র কচি মনে, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে সুশোভন সরকারের প্রবন্ধটিতে—

''কলেজের ইতিহাসে ডিরোজিও-র ব্যক্তিত্ব এক নতুন যুগের সূচনা করে। এই তরুণ শিক্ষক চুম্বকের মত বয়স্ক ছাত্রদের নিজের চারপাশে টেনে আনতে লাগলেন।''

হিন্দু কলেজের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয় ছাত্রদের সূত্রে। এবং এই সূত্রেই তিনি রক্ষণশীলতা বনাম প্রগতিবাদের সংঘর্ষের মূল বিন্দুতে পরিণত হন। হিন্দু কলেজ, হিন্দু কলেজের ক্লাস ঘর, ক্লাস ঘরের ছাত্ররা—এই সূত্র শৃঙ্খলা অনুসরণে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল নবজাগরণের মন্ত্র - প্রাণ। নব জাগরণের সূচনা হয়েছিল মূলত যে পাশ্চাত্য ভাষা ও শিক্ষা আয়োত্তের মধ্য দিয়ে, সেই শিক্ষা কাঠমোয় যৌক্তিকতা বা তর্ক প্রাধান্য কে সংযুক্ত করেছিলেন ডিরোজিও। কাব্য সাহিত্য বিষয়ক পাঠদানের মধে তিনি এইসব তরুণ কচি মনগুলিকে আটকে রাখতে চান নি। বস্তুত পরবর্তীকালে যে আঘাতের মুখোমুখি হতে চয়েছে বঙ্গসমাজ সেই আঘাতের সূচনা ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে সভা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। এ প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র মৈত্রের প্রবন্ধ থেকে কিছুটা অংশ আমরা আলোচনার জন্য দেখতে পারি—

ডিরোজিও বিদ্যালয়ে যে আলোচনা সভা স্থাপন করেছিলেন, তাতে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেমী ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের যোগদান করার অধিকার ছিল, ঐ সভায় কাব্য ও সাহিত্য থেকে এবং নীতিদর্শন থেকে পাঠ দান করা হত। প্রায় প্রত্যহ ক্লাস বসবার পূর্বে বা পরে সভা বসত।''

যে আগুন নব জাগ্রত বাংলার দিকে দিকে জ্বলে উঠবে, সেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ক্রমান্বয় বিস্তার এই সময় পর্ব থেকে শুরু হয়। এই আগুন জ্বালানোর কাজই করে গেছেন ডিরোজিও আজীবন। শুধু ক্লাশ ঘরের মধ্যেই নয়, বাইরে ও মুক্তি এবং মাদকতার নতুন উৎস পশ্চিমী ভাবধারা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি তাঁর ছাত্রদের জ্ঞান সম্প্রসারণের চেষ্টা করতেন এবং তাতে তিনি সফল ও হয়েছিলেন। তাদের মনে তিনি যে ছাপ এঁকে দিয়েছিলেন, অনেকেরই মনেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই ছাপ অমলিন ছিল।

বাংলার নবজাগরণের Plat form-এ ডিরোজিওর আবির্ভাব। তাঁর এই মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিলেন ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও দুজনের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা ছিল পৃথক। হেয়ার শিক্ষাবিদ্ কিংবা সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, প্রগতিবাদী হিসেবে ও তাঁর পরিচিতি নেই। শুধুমাত্র অর্থোপার্জনের জন্য ভারতে আসা এই বহির্ভারতীয় মানুষটি সারাজীবনে উপার্জিত সমস্ত অর্থ নিঃশর্তে নির্দ্বিধায় উৎসর্গ করে দিলেন এদেশে শিক্ষাপ্রসারের, এদেশের ছেলেদের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবার মহৎ কর্মপ্রেরণায়। মহৎ ত্যাগ নবজাগরণের একটি অনিবার্য শর্ত, এই শর্ত নিঃশর্তে পূরণ করেছিলেন ডেভিড হেয়ার। হেয়ার ও ডিরোজিও ছিলেন ঘনিষ্ট। হেয়ারের জীবন ছিল ডিরোজিও কাছে অনুপ্রেরণা, একথা ডিরোজিওর একাধিক প্রবন্ধে আভাসিত। আর ডিরোজিও —নব জাগারণের তরুণ চারাটিকে সবসময় আগলে রাখতেন বয়সে জ্যেষ্ঠ ডেভিড হেয়ার। এক্ষেত্রে হেয়ার শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেন নি। ডিরোজিও অপ্রয়োজনীয়কে ত্যাগ করাকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন, কিন্তু এটা হেয়ার পারেন নি। ইনস্টিটিউট কনসেপশন-এর সঙ্গে আপোষ করতে। হেয়ার বহু চেষ্টা করেও আটকাতে পারেননি ডিরোজিওর বহির্গমন, স্বেচ্ছানির্বাসন। ডিরোজিওকে চলে যেতে হয়েছিল হিন্দু কলেজ থেকে, কিন্তু ছাত্রদের উপর তাঁর প্রভাব কখনো কমেনি। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন আমাদের দেশে এক অর্থে প্রথম ছাত্র সংগঠন। যদিও প্রথম দিকে এই সভায় কেবলি বিদেশী কাব্য-সাহিত্য-দর্শনের চর্চা হত, কিন্তু ধীরে ধীরে এই সভাই হয়ে ওঠে মননশীলতায়, যুক্তি নির্ভরতায়, প্রগতিবাদী মনোভঙ্গিতে সামাজিক অন্ধকারের বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদের উৎস স্থান। বাংলার সমাজ জীবনে অন্ধ সংস্কার আর রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে বাংলার নবজাগরণ প্রগতিশীল সমাজ আন্দোলনের রূপ নেয়, সেই বিদ্রোহের একেবারেই প্রত্যক্ষ সূচনা হয় এই আকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে। এই সংগঠনের চরিত্রে নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বহু বছর পরে রেভারেন্ড লালবিহারী দে লেখেন—

''এই সংগঠনের সভাগুলিতেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ, কলকাতার সেরা তরুণেরা তৎকালীন প্রধান প্রধান সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রচলিত ধর্মীয় অন্ধ সংস্কার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ছিল তাঁদের আলোচনার মূলসুর।''

পল্লব সেনগুপ্ত উনিশ শতকের বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমিতে সমাজের মূল ধারাকে প্রধান তিনটি ভাগে বিভাজিত করেছেন। একেবারে প্রথমটি হল রক্ষণশীল সমাজপতিদের শাখা; তাতে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রসময় দত্ত প্রমুখ। দ্বিতীয়ভাগে ছিলেন সেসব সংস্কারবাদী অথচ মধ্যপন্থী পুরুষেরা, যাদের মধ্যে ডিরোজিওর সমকালে প্রধান ছিলেন স্বয়ং রামমোহন আর তৃতীয় দলের অধিনায়ক ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী।

এই প্রবন্ধে আলোচনার পূর্বভাগে বলা হয়েছে যে, ডিরোজিও বাংলার রেণেশাঁস এমন এক আঘাত এনে ছিলেন, যা ছিল রেণেশাঁসের নিয়মানুসারে একান্ত কাঙ্খিত অথচ মধ্যপন্থী রামমোহন এবং তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে সেই আঘাত আসাটা স্বাভাবিক ভাবে অসম্ভব ছিল। ডিরোজিওর নেতৃত্বে যে নতুনের দল আকাশে ঝড় তুলতে তৈরি হল, তাঁদের প্রগতিমুখিন ভাবনার সঙ্গে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সংঘাত যখন অনিবার্য হয়ে উঠল, তখন রামমোহনের মত মধ্যপন্থীদের ও ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল প্রগতিপন্থীদের সঙ্গে। এটা সেই অগ্নিবর্ষী যুগপর্বে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে হয়েছিল। ডিরোজিওর ছাত্ররা উনিশ শতকীয় বাংলায় প্রগতিবাদের মশাল ধরেছিল মুষ্টিবদ্ধ হাতে। ডিরোজিওর জীবৎকাল স্বল্প অথচ তাঁর যে শিক্ষা সঞ্চারিত হয়েছিল ইয়ং বেঙ্গলীয়দের মধ্যে এবং কর্ষিত হয়েছিল অজস্র নবীন আধুনিক চিন্তা সচেতন তরুণের মধ্যে, সেই শিক্ষা তৈরি করে দিল বাংলাদেশের এক সুদীর্ঘ আধুনিকতার ঐতিহ্যে। ১৮৩৮ এর ২০শে ফেব্রুয়ারী ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ পাঁচজন বিশিষ্ট ছাত্র এক আবেদন পত্র প্রচার করেন। এই ছাত্রদের মধ্য তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছিলেন মুখ্য। আর ঐ আবেদন পত্রে বলা ছিল যে, দেশের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার জন্য তারা একটি সংগঠন চান ও সেই উদ্দেশ্যে ১৮৩৮ এর ২২শে মার্চ সংস্কৃত কলেজে তারা একটি সভায় আয়োজন করেন। সভায় উপস্থিত হন প্রায় শতাধিক ব্যক্তি, এবং যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ছাত্র বিশেষত ডিরোজিও প্রভাবিত ছাত্র। ডিরোজিওর ছাত্ররা খুব দ্রুত Society for the acquistion of general knowledge নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের ছাপানো সভ্যতালিকা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশই ছিলেন ছাত্র, প্রধানত হিন্দু কলেজের। আর একথাও সুস্পষ্ট যে এই ছাত্ররা, যাঁরা পরবর্তীকালে বাংলার জাগরণে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তারা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসেছিলেন।

নব জাগরণের ধারা, যা ক্রমেই বাংলার প্রগতিশীল আন্দোলনের রূপ নেয় এবং অচিরেই এই আন্দোলনে সংযুক্ত হয় স্বাদেশিকতার বোধ। ডিরোজিওর ছাত্ররা স্বাধীনতার ভাবনায় নিজেদের সামিল করেছিলেন; সামাজিক অন্ধ সংস্কারের বাঁধন ভাঙাই ছিল ইয়ংবেঙ্গলীয়দের সাধনা, আর এই সাধনাকে পুষ্ট করল পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার বাসনা। নির্মল কুমার বসু বলেছেন:

> ''ইয়ং বেঙ্গলের দুই উপাস্য দেবতা ছিলেন, স্বাধীনতা ও যুক্তিবাদ।''

স্বাধীনতার সংকল্পে ও আমরা দেখি ডিরোজিয়ানদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, পুরোপুরি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্রমশঃ তাঁরা রাজনৈতিক হয়ে উঠলেন। ১৮৪১ এ ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী গঠন করলেন দেশ হিতৈষী সভা। সারদা প্রসাদ এর প্রতিষ্ঠা সভায় বলেছিলেন—

> ''ইংরেজ-রাজত্বের গোড়া থেকে আমাদের শাসক শ্রেণীর মতলব ছিল আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা। স্বাধীনতা হীনতাই আমাদের সমস্ত দুর্দশার মূল কারণ। তাই আমার প্রস্তাব এই যে দেশের দুর্গতি মোচনের জন্য আমাদের প্রথমত ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; দ্বিতীয়ত দেশকে ভালবাসতে হবে; দেশপ্রেমই হবে ঐক্যের ভিত্তি এবং সেই সংঘশক্তিকে পরিচালনা করতে হবে জাতীয় কল্যাণের পথে।''

—অর্থাৎ বিধবা বিবাহ থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রগতিশীল কর্মোদ্যোগের মধ্যে দিয়ে ডিরোজিয়ানরা নবজাগরণের ধারাকে প্রবাহিত রাখতে চেয়েছিলেন, অনিবার্য ভাবেই শাসক শক্তির পরাধীনতায় কন্টকিত দেশের ভবিষ্যতকে অত্যাচার ও অবিচারের শিকল থেকে মুক্ত করবার অভিপ্রায় সংযোজিত হয়েছিল ডিরোজিও প্রভাবিত নবজাগরণের ধারায়।

ডিরোজিও ভারতবর্ষে জন্মেছেন। ভারত তাঁর স্বদেশ ভূমি। তিনি লিখেছেন— 'To India-My Native Land'। যুক্তিবাদী ডিরোজিও নিজের সম্পূর্ণ জীবনকে দেখেছিলেন রূঢ় যুক্তির আরশির ভিতর দিয়ে। অথচ তাঁর মনের একেবারে গোপন এক বিন্দুতে বিরাজমান ছিল যে ভারত বিজড়িত সরসতা, কোমলতা, তার পেলব ভঙ্গিতে বিন্দুমাত্রও স্পর্শিত হয়নি যৌক্তিক রূঢ়তা। এবং এক অদ্ভুত স্টাইলে সেই কোমল অনুভবই সারাজীবন তাঁর ভিতরে ভিতরে স্পন্দিত হয়েছে এবং তাঁকে সঞ্জীবিত করেছে। একটি সনেটের একেবারে শেষ অংশে ডিরোজিও বলেছেন—

> '...এখন স্তব্ধ তারা—
> জাগবে আবার মিড়ে-মুর্ছনে, তবু তুমি যদি বাজো
> স্বর্গলোকের সুর স্পন্দনে, আমার দেশের বীণা!

শুধু একবার আমার স্পর্শে বেজে ওঠো ঝংকারে।”

জিরোজিও তাঁর স্বদেশ ভূমি, নেটিভল্যান্ডকে দেখেছিলেন তাঁর অজস্র তরুণ ছাত্রের মুখাবয়ব। বাছ্‌বিচার, কুবিশ্বাস, অন্ধ সংস্কার মুক্ত এক উজ্জ্বল ভারতবর্ষের স্বপ্নই ছিল তাঁর স্বদেশ চেতনার মূল বিন্দু।

ডিরোজিও ছাত্ররা ছিল প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ মাধ্যম। তিনি হিন্দু কলেজের বাইরে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন তাঁর অনুরাগী ছাত্র শিষ্যদের শিখিয়ে ছিলেন স্বাজাত্যমুখী জাগরণের ভাষ্য। তিনি মুক্ত স্বাধীন ভারতকে দেখতে চাইতেন। তাঁর এই স্বপ্নই স্বাধীনতার লক্ষ হিসেবে সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। ডিরোজিও ঝড়ের পাখি আর বাংলার আকাশে তাঁর আনাগোনা পথ ধরে যে ঝড় উঠেছিল, তার অসংখ্য তরঙ্গ তাঁর অজস্র তরুণ ছাত্রেরা। নবজাগরণের এই শক্তিগষ্ঠীর সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছেন অনেক ঐতিহাসিক গবেষক সমালোচকেরা। হয়তো সত্যিই এই ইয়ং বেঙ্গলীয়রা সীমাবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু এর চেয়েও বড় সত্য এই যে, এঁরা উনিশ শতকীয় সমাজ প্রেক্ষিতে মধ্যপন্থী সমাজ সংস্কারকদের তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক সীমাবদ্ধতাগুলিকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। আসলে বাংলায় যে নবজাগরণ শুরু হয়েছিল, তা উৎপত্তিগত ভাবেই একটা অসম্পূর্ণতার রোগে সংক্রামিত হয়। বরং এই সংক্রামণের মধ্যে ডিরোজিওর সূত্র ধরে যে যুক্তিবাদের চিকিৎসা শুরু হয়, সেটাই বাংলার রেনেশাঁসকে প্রগতিশীলতার হাত ধরিয়ে দিয়েছে। দর্শন চিন্তায় ড্রামন্ড ছিলেন যুক্তিবাদী ডেভিড হিউমের অনুগামী। ঈশ্বর চিন্তা বা ধর্মচিন্তা নয়, মানবধর্মই যে মহত্তম এই চিন্তাটাই ছিল বাংলার নবজাগরণের সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ণ অঙ্গ, —এটি ডিরোজিও অর্জন করেছিলেন তাঁর অধ্যাপকের শিক্ষাতে আর এই শিক্ষাই ইয়ং বেঙ্গলীদের আজীবন ব্রত হোক— এটাই চেয়েছিলেন ডিরোজিও।